আমার দেখা অজিতদা

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বাড়ির সামনে রোজ সকালে এক ভদ্রলোক হেঁটে যান। অ্যাভারেজ বাঙালির তুলনায় বেঢপ লম্বা, ঘন কালো রং, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, পরনে হাতে কাচা ইস্ত্রি না করা দেহের তুলনায় বেশ ছোটো পাঞ্জাবি পাজামা, পায়ে আধা খয়ে যাওয়া চটি, কেমন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলা কে এই মানুষটি ? কারও দিকে তাকায় না অথচ জানান দিয়ে যায়। এই মানুষটি ঘিরেই সকলের অব্যক্ত কৌতুহল। চারদিকের পরিবেশে বেমানান ও আগন্তুক সম্পর্কে কেন যেন আমার ভিতরে অজানিতেই একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক যশোর রোডের দিক থেকে শ্যামনগর রোড ধরে পূর্ব দিকে সোজা রাস্তা ধরে চোখের আড়াল হয়ে যান। টের পাইনি অথচ রোজ ওই একই সময়ে মানুষটিকে দেখার জন্যই রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়তাম। মাস খানেক পরে একদিন অল্পঅল্প বৃষ্টি পড়ছে ভ্রুক্ষেপ নেই ছাতা তো মাথায় নেইই, কোথাও দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাবার চেষ্টাও নেই, চটির ঝাপটায় গোটা জামা ও পাজামায় কাদার ছিটে স্প্রে হয়ে গেছে – এ কেমন মজার মানুষ, কোথায় যায় রোজ। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি তাঁর পিছু নিয়েছি – ছোটো ব্রিজ পেরিয়ে, প্রফুল্লকানন ছাড়িয়ে এখন যেখানে ভি. আই. পি রোড তাও পেরিয়ে কেষ্টপুর গ্রামের দিকে চলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে অধুনা যে অঞ্চলের নাম রবীন্দ্রপল্লি সেখানে একটা বেশ বড়োসড়ো একতলা বাংলো ধরনের বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। যাক গন্তব্যস্থান জানা হল। কিন্তু তাতে আমার কি?

কিছু তো বটেই। মানুষ্টিকে ঘিরে কিশোর মনে রহস্য আরও বাড়ল। বাগজোলা খালের হাজার হাজার রিফিউজি তাঁবুর মধ্যে এই ব্যতিক্রমী সাদামাটা বাড়িটা শোনা গেল এলাকার উকিল বাড়ি নামে পরিচিত। কৌতুহল বৃদ্ধির সুবাদে এও জানা গেল বার্মা না কোথা থেকে উড়ে আসা উকিলবাবুর দুই মেয়ে আছে, আর আমাদের এই রহস্যময় ঢ্যাঙা মানুষটি তাদের গৃহ শিক্ষক। দিন কয়েকবাদে একদিন কলেজ বেরুচ্ছি দেখি দুই যুবতির সঙ্গে তুমুল বক্তৃতা করতে করতে চলেছেন সেই মানুষটি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে রচিত হল একটা গোরা যেন সুচরিতা ও ললিতার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণ্না করে চলেছেন। পাঠক এই ছবিটিকে কি আদিখ্যেতা বলে ভাবছেন ! এতদিন পর আমারও মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন যে সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের গোরা

পড়েছি , চোখ তখন একটু স্বতন্ত্র ধরনের মেয়ের মধ্যেই সুচরিতা বা ললিতাকে খুঁজে ফেরে। এখনকার ছেলেদের এমন হয় কিনা জানি না, আমাদের সময়ে বইয়ের ভালো ভালো চরিত্রগুলো এমন আচ্ছন্ন করে ফেলত। চেনাশোনার মধ্যে অবয়ব পেতে চাইত। চতুর্দিকে হতশ্রী রিফিউজি অধ্যুষিত, নিম্নবিত্ত বৈচিত্রহীন সমাজ জীবনের মধ্যে দুটি বেশ আধুনিকা, নম্র, মার্জিত রুচির যুবতির মাঝখানে উচ্চকণ্ঠে কথা বলে চলেছেন সেই মানুষটি , দু-পাশে দুজন নীরব শ্রোতা। এ-দৃশ্য আমাদের ওইসব অঞ্চলে তখন বিরল, বেশ সাড়া জাগানো, তরঙ্গহীন পরিবেশে বেশ সম্ভ্রম মিশ্রিত গুঞ্জন। পিছু নিলাম অমন অনর্গল বক্তা ও আবিষ্ট দুই শ্রোতা যশোর রোডে গিয়ে বাসে উঠলেন শ্যামবাজারের দিকে।

এরপর বোধকরি দিন দশেক বাদে কথা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। সেও এক মজার ঘটনা। কলেজ বেরুচ্ছি, সঙ্গে মা রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছেন, সঙ্গে সংসারের এটা ওটা কথা। হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ “এই যে ভাই একটা সেফটিপিন দিতে পারো, চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেছে। এদের কাছে নেই।“ মেয়ে দুটির মুখ লাল দেখে বোঝা গেল বেশ বিব্রত। মনে মনে ভাবলাম বেশ হয়েছে – আধুনিকা মেয়ে তো, কে জানে ব্রাহ্মও হতে পারে, অদের হাতে আমাদের মা বোনেদের মত চুড়িতে সেফটিপিন থাকতে নেই। আমার মা তাড়াতাড়ি হাত থেকে সেফটিপিন খুলে আমাকে দিলেন। আমি কয়েক পা দ্রুত এগিয়ে সেফটিপিন হাতে তুলে দিতে পেরে কেমন যেন কৃতার্থ হলাম, তখনকার অবস্থাটা উপভোগও করলাম। আমার বাড়ি কোনটা জিজ্ঞেস করলেন, দূর থেকে মাকে নমস্কার জানালেন ইতিমধ্যে চটিতে সেফটিপিন আটকে নিয়ে যথারীতি ভাষণ দিতে দিতে চলে গেলেন।

এভাবে আরও দুয়েকদিন সেফটিপিন সাপ্লাই দিতে দিতে আলাপ হল পরিচয় হল, বলাবাহুল্য মানুষটির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। মনে মনে একটু রাগও হল একদিন বলেই দেখলাম ওই মেয়ে দুটো আপনাকে একটা চটি কিনে দিতে পারে না ! হো হো করে দুনিয়া কাঁপানো হাসির তরঙ্গ তুলে বললেন – ওদের তো আমি পড়াই। আজ টিউশনির টাকা পেয়েছি চলো আমার সঙ্গে। মেয়ে দুটিকে ঘিরে এই মানুষটাকে নিয়ে রোমাঞ্চ আমার মনে যে দানা বাঁধছিল ধাক্কা খেল। আমাকে নিয়ে কাছেই মিষ্টির দোকানে ঢুকলেন । প্রচুর পরিমানে অমৃতি আর দই নিয়ে একটা টেবিল দখল নিয়ে বসে সেই একই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলে চললেন। এমন মন মাতানো, বিপক্ষকে চার আর ছক্কার দাপটে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা আমি এই বয়স পর্যন্ত আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পরিচয় হল নাম জানলাম অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়,

কয়লা কুঠির দেশের লোক। অনর্গল শেক্সপিয়ার, বার্নার্ড শ, ব্রেখট, রবীন্দ্রনাথ আউড়াতে পারেন। পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সুতরাং দাদা মানতেই হল। জিজ্ঞেস করলেন রাজনীতি করো ? নাটক করো না ? আমি তখন সবে রাজনীতি করছি, গণনাট্যে যোগ দিয়েছি দেশবন্ধু নগর বাগুইহাটি অঞ্চল কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার নাটক দেখনি? তখনও দেখিনি কিন্তু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন চতুর্দিকে সাড়া ফেলেছেন এটা কানে এসেছিল। প্রায় ঘন্টা দুয়েক অসংখ্য বিষয় অজস্র কথা শুনে প্রায় অর্ধেক অমৃতি এবং দই ফেলে রেখে উঠে পড়া হল। কেননা দুজনের পক্ষে অত মিষ্টি খাওয়া সম্ভব ছিল না। মনে মনে প্রায় নাড়া-বাঁধা শিষ্য হয়ে গেলাম এবং মধ্যবিত্ত বলেই বুঝলাম লোকটাকে একটা ফ্রেমে ফেলে হিসাব করা যাবে না, বোধকরি একটু বোহেমিয়ানও আছে। সন্দেহ হল নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে বা বেরিয়ে এসেছে কোনো অদৃশ্য টানে। নিজের স্বল্প বুদ্ধিতে অনুমান করেছিলাম এর আছে সর্বগ্রাসী শক্তি, এ কারও মনের একান্ত মানুষ হবে না, অনেককে কাঁদাবে , নিজে তুবড়ির মতো চতুর্দিক মাতাবে , রঙে রঙে রঙিন করবে, এর মধ্যে গাঢ় সংসার তান্ত্রিক মূর্তির সঙ্গে আউল বাউল বৈরাগী মন মিলে মিশে রয়েছে। এ লোকটা সমগ্র একটা কালাপাহাড় তবে শুধু সহজ ভাজন, সহজ জয় নয়, তিল তিল করে তিলোত্তমা প্রতীক্ষাও ? গড়তে পারবে।

সময়টা তখন ১৯৫৪ পরবর্তী কয়েক বছর। নাটক তখন আমি বেশ কয়েকটি করেছি দেশবন্ধু নগর শাখা বা পূর্ববর্তী চলতি বাসরে শ্রদ্ধেয় নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং নাট্যকার মনোরঞ্জন বিশ্বাসের সাহচর্যে। কিন্তু নাটক যাকে বলে আমার ‘কাপ অফ টি’ ছিল না। দলে পড়ে নাটক করতাম ছোট মাঝারি চরিত্রে। চারুপ্রকাশ ঘোষ, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, সবিতাব্রত দত্ত প্রমুখ দিকপালের সঙ্গে একটি শো রঙমহলেও করেছিলাম দিগিনদার সাহায্যার্থে মোকাবিলা নাটকে। অজিতদা আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিলেন অবশ্যই দুরন্ত অভিনয় এবং সুশিক্ষিত ও সর্বাধুনিক পরিচালন ক্ষমতার জন্য। কিন্তু বোধকরি তার চেয়েও বেশি তাঁর ব্যক্তিত্ব, গভীর ও বিচিত্র পড়াশোনা, উদাত্ত আবৃত্তি ও পাঠ এবং মোহনীয় আবেশ সৃস্টিকারী বাক ক্ষমতার জন্য তিনি আমার আরও কাছের হয়ে উঠেছিলেন। বিচিত্র বোহেমিয়ান মানুষ, আমাদের চোখে কেমন যেন অধরা মাধুরী। পড়েন মণীন্দ্র কলেজে, নাটক করলেন দীপেন সেনগুপ্তর সঙ্গে ক্লাইভ হাউস ময়দানে, মাতিয়ে দিলেন। থাকার জায়গা নেই, খাবার ঠিকানা নেই, রাজনীতির প্রতি দুর্বার আকর্ষণ কতটা ভিতরের টানে, কতটা বাইরের

আকর্ষণে নির্ণয় করা কঠিন। তবে অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্য জীবনের গড়ে ওঠার পরিমণ্ডল অবশ্যই গণনাট্য আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। নির্দিষ্ট আশ্রয় নেই, রক্তের সম্পর্কের আপন জনের যত্ন নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় এগিয়ে দেওয়ার মানুষ নেই কিন্তু তাঁর জন্য কোনো আপশোস নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘুঘুডাঙা গণনাট্য সংঘের প্রণব মুখার্জী বা দিলীপ মুখার্জী কিংবা শংকর ঘোষের বাড়িতে থাকা খাওয়া নাটকের মহড়া দেওয়া এবং একে একে কয়েকটি নাটকের প্রযোজনা। দমদম-বাগুইহাটি অঞ্চলে তখন পাঁচটি গণনাট্যের শাখা। দমদম-পাতিপুকুর অঞ্চলে ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় (ক্ষেতু দা), শংকর ঘোষ, প্রণব মুখোপাধ্যায় (মন্টি), রাধারমণ তপাদার, সুশীল মিত্র, বরুণ সেন, চিররঞ্জন দাশ ওদিকে দেশবন্ধু নগরে দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অমল গুহ, সুভাষ ভট্টাচার্য্য, স্মৃতি বিশ্বাস প্রমুখ দিকপাল নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী। এরই মধ্যে একটি মানুষ এল সকলের সঙ্গে মিশল এবং জায়গা করে নিল তিনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তখনও অজিতেশ নন। দমদমে তখন নতুন নাটক বলতে অজিতদা, বিদেশি নাটকের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যম অজিতদা, গণ্নাট্য সংঘের মধ্যে থেকেও গণনাট্যের অভিনয়ের মডেল ভেঙে নতুনত্ব সৃষ্টি করা তাও অজিতদা। নিত্য পালাবদল, প্রতি মুহুর্তের পরীক্ষানিরীক্ষা। মাটির ভাঁড়ে চা শুকনো কয়েকটি রুটি বা শুধুই চায়ের পর চা আর সারা রাত জেগে পাতিপুকুরের বস্তি ঘরে বসে ডিকটেশান দিয়ে নাটক লেখা, কেমন যেন এই সব শুনে অজিতদাকে মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করতে ইচ্ছে করত। নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা কোন অজিতদা বড়ো, কিংবা বক্তা বা সংগঠক অজিতদা আমাদের চোখে সে সময় কে বড়ো ! ঠিক পরিমাপ করতে পারতাম না।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। দমদম-পাতিপুকুর অঞ্চলে একটা ডেকরেটারের দোকান ছিল, তাঁর মালিক (এখন আর নাম মনে নেই) একদিন বিপন্ন অবস্থায় অজিতদাকে পথে ধরলেন, আমি তখন তাঁর পথের সাথি। সন্ধেবেলায় সাজাহান নাটক, স্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে, কিন্তু ঔরঙ্গজেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অতএব অজিতদাকে ঔরঙ্গজেব চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। কমিউনিস্ট, গণনাট্যের শিল্পী অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কাতর আবেদন ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন রাজনীতির, ভিন্ন নাট্যবোধের একজন মানুষের। এমন প্রস্তাবও করা যায় কাউকে ! কিংবদন্তি নাটকের সেই কিংবদন্তি চরিত্র ঔরঙ্গজেব। দীর্ঘ মানুষটির মাথামুখ আমার কাছে যেন আরও উঁচুতে মনে হল, তাকিয়ে আছি কয়েক মুহুর্ত। আমার ঘাড়ে হঠাৎ একটা থাবা – বুঝলাম ভাবনা শেষ, এইবার সিধান্ত ঘোষনা। চিন্তান্বিত, গম্ভীর, আত্মবিশ্বাস মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন বইটা

দিয়ে যান, রাত্রে ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। সাজাহান হল, লোকে দেখলেন ভিন্ন মাত্রার এক ঔরঙ্গজেব চরিত্র, সমস্ত সংলাপ স্মৃতি থেকে উৎসারিত হয়ে দর্শকের মধ্যে মুক্তোর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। দমদম অঞ্চলের সাবেকপন্থী নাটুকেদের মধ্যে তারপর থেকে অজিতদা দেবতার আসনে। অনেকগুলো প্রাচীন মরচে পড়া নাটক-করা লোকও অজিতদার ভক্ত হয়ে গেল।

সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালানোর পলতে যেমন দিনের বেলায় মা পিসিমার হাতে পাকানো হয় তেমনি অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় আজীবন দেদীপ্যমান প্রদীপের পলতে পাকানো হয়েছিল দমদমের পার্টিতে, দমদম গণনাট্য আন্দোলনে, শ্রমিক বস্তিতে, কারখানার গেটে গেটে। তখনকার কমুইনিস্ট পার্টিতে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই কাকাবাবুর মতো এক একজন পিতৃতুল্য অথচ মাতৃহৃদয় সম্পন্ন নেতা থাকতেন। দমদমে যেমন ছিলেন বিভূতি দেব, মনা দাশ, সুধীর ভট্টাচার্য, সুনীল সেন প্রমুখ। বিশেষ করে পার্টি সম্পাদক বিভূতি দেব বিচক্ষণ দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন এমন ঝোড়ো পাখি, উড়ো পাখিকে বাঁধতে হবে, বশ করতে হবে, দাঁড়ে ধরে রাখতে হবে। আর তখন নেতাদের বিশ্বাস ছিল নাটক গানের সঙ্গে একটু সক্রিয় রাজনীতি, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলে সমাজবাদী শিল্পী বা স্রষ্টা হিসেবে নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় না। দমদমের নেতৃত্ব ভালোবাসা, প্রীতি, সাহচর্য, তাত্ত্বিক শিক্ষা, সাংগঠনিক কাজকর্ম ইত্যাদির মধ্যে অজিতদাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। সাংগঠনিক প্রশ্রয়, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং আশ্চর্য কর্ম দক্ষতায় অজিতদা মাত্র পাঁচ-ছয় বছরের দমদম পার্টির জীবনে একের পর এক শীর্ষস্থান স্পর্শ করেছিলেন। পাঁচটি শাখার সমন্বয়ে গটিত দমদম গণনাট্যের সম্পাদক পদ, সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত দমদম কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল কমিটির সদস্যপদ, জ্যোতি উইভিং, শ্যামনগর রড কল ইত্যাদি কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উদ্দিপ্ত করার ক্ষেত্রে সর্বত্র অজিতদা প্রথম সারিতে। সব মানুষের অগ্রগতির গ্রাফ চিত্র আঁকলে হয়তো ওঠানামার বাঁক লক্ষ করা যাবে। কিন্তু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য, তার উন্নতির গ্রাফ সর্বদাই উত্তুঙ্গ। দমদম গণনাট্যের সাংগঠনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি কমরেড বিভূতি দেবের সস্নেহ আশীর্বাদে, অসীম ব্যক্তিত্বে, নতুন নাটক নির্মাণের অভাবনীয় সাফল্যের সুবাদে গণনাট্য সংঘের প্রাদেশিক সম্পাদক পদ খুবই অল্প বয়সে এবং স্বল্প সময়ে লাভ করেছিলেন।

খ্যাতি প্রতিষ্ঠা শিক্ষকতার কাজ শিক্ষক হিসেবেও সাফল্য এই কয়েক বছরের মধ্যেই অজিতদা পেয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকতার চেয়ে বেশিই পেয়েছিলেন। আর এর অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে

পেতে শুরু করেছিলেন ঈর্ষা, কালির ছিটে ইত্যাদি। অজিতদার মধ্যে এবার দেখা দিল আর-এক ঝড়, প্রতিভার বেহিসেবী মত্ততা, শিল্প না মতাদর্শ, শিল্পী না রাজনীতি এই সব প্রশ্নে দোলাচলতা , ক্ষুদ্র উপদলীয় খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত হওয়ার যন্ত্রনা। আমরা বুঝতে পারছিলাম এই ঝড়ে বোধ করি শীঘ্রই নোঙর ছিঁড়বে , ঝোড়ো পাখি রাজনীতির বাঁধন ছিঁড়তে চাইছে। কিন্তু অজিতদার কাছে এসব দ্বন্দ্ব, দোলাচলতা ছিল আন্তরিক। সস্তা আরও আরও প্রতিষ্ঠা খ্যাতির লোভ নয়, অন্তত তখনও নয়।

অজিতদা ও আমার সম্পর্কের শেষ ঘটনাটি এবার বলে শেষ করব, আর এটা ছিল সম্ভবত অজিতদার জীবনের যাত্রা পথের সবচেয়ে বড়ো বাঁক। অজিতদা তখন পাতিপুকুর গণনাট্যের ঘরের আস্তানা গুটিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্যামনগরের বিখ্যাত কমরেড অশোক দত্তের টিনের চালের ঘরে। অশোক দত্ত তখন স্বাধীনতা পত্রিকার ত্রিশ টাকা ভাতার কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। মুলি বাঁশের বেড়া ও টিনের চালের একখানা ঘর ও বারান্দায় যে কত নিরাশ্রয় কমিউনিস্ট, পুলিশের তাড়া খাওয়া বিপন্ন মানুষের আশ্রয় হত তার অন্ত নেই। অশোকদা ও বৌদি ছিলেন ওই অঞ্চলের পার্টির কেন্দ্রবিন্দু। হাসি মুখ আর চা ছিল অবারিত। আমার বিশেষ লোভ ছিল অশোকদার নিজস্ব গ্রন্থাগারের প্রতি। সংসারকে বঞ্চিত করে, আধপেটা খেয়ে, যে বই কেনা যায় তার দৃষ্টান্ত ছিলেন অশোকদা। চাঁদা তুলে চা মুড়ির পয়সা তোলা হতো কিন্তু বই অশোকদাকে কিনতেই হবে। আমার রাজনৈতিক গুরু এই অশোক দত্তের বাড়িতেই অজিতদার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা। আমি স্বভাব লাজুক, তাতে মূলত নাটকের লোক নই সুতরাং ওই রকম একটা সর্বদা ফুটন্ত জলের মতো মানুষের সঙ্গে আমার ভাব হওয়ার কথাই নয়। নাটকের কথা হলে যেমন নিজেকে গুটিয়ে নিতাম আবার রাজনীতি বা মতাদর্শগত তাত্ত্বিক আলোচনা হলে অনেক সময় বিতর্ক জুড়ে দিতাম। হঠাৎ একদিন সকালে অশোকদার টিনের ঘরের চালার পাশে গাছের নীচে অজিতদা আমাকে দেকে নিয়ে মাটিতেই লেপটে বসে পড়লেন। স্বভাবসিদ্ধভাবে কাঁধে এক মর্মান্তিক ঝাঁকুনি দিয়ে অজিতদা বললেন, ‘তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে, আর সেটা জীবনের একটা বড়ো সিদ্ধান্ত বিষয়ে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।‘ আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি কী সে সিদ্ধান্ত, আর সকলকে ছেড়ে আমার সঙ্গেই বা পরামর্শ কেন ? আমাকে নিশ্চুপ দেখে তিনি তড়িঘড়ি বলে ফেললেন, ’আমি বিয়ে করব।‘ ‘সে তো খুব ভালো কথা’ এ কথা বলার সঙ্গে ভাবছি কাকে বিয়ে সেই সুচরিতা না ললিতা কোনটিকে। এঁদের ঘিরে বৌদি অশোকদা মাঝে মধ্যে অজিতদার সঙ্গে ঠাট্টা করতেন,

যদিও আমার সে সাহস ছিল না। এই ধরনের আলোচনায় নীরব আগ্রহী শ্রোতা হয়ে বসে থাকতাম। আমার কল্পনা, রোমান্সে জল ঢেলে দিয়ে তিনি আবার চট জলদি বললেন, 'আমি ঠিক করেছি লিলিদিকে বিয়ে করব।' আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এও কি সম্ভব ! লিলিদিকে আমি সামান্যই জানতাম। অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী, বিভূতি দেবের সহকর্মী এবং বোধহয় বেহালা অঞ্চলে একটি স্কুলের শিক্ষিকা। পোড়খাওয়া নিতান্তই মধ্যবিত্ত চেহারার আপাদমস্তক রাজনৈতিক নেত্রীর সঙ্গে অজিতদার মতো একজন সর্বাত্মক নায়কের বিয়ে, বয়সের প্রশ্ন তো তাৎক্ষণিক বিস্ময়ের অতলে তলিয়েই গেছে। সাহস সঞ্চয় করে বেশ চোয়াল শক্ত করে এক নিশ্বাসে বলে ফেললাম, 'আপনি অশোকদা, বিভূতিদার মত না নিয়ে, আমার মত কেন চাইছেন ? আপনি ঠাট্টা করছেন ?' আবার কাঁধে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার মতের নিশ্চয়ই মূল্য দিই, নাহলে এত কমরেড থাকতে তোমার মতামত কেন চাইব? অশোকদা উদার হৃদয়, তিনি মত দেবেন, বিভূতিদা আমার, লিলিদির দুজনেরই নেতা, তাঁর মত তো নিতেই হবে।' তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বিয়ে করতে হলে পার্টির অনুমতি নিতে হত। যাহোক আমার চোখের সামনে লিলিদির সহজ সরল দিদি দিদি মুখটা ভেসে উঠল আর আমি যেন প্রত্যক্ষ করলাম অজিতদা বিরাট বিরাট পা ফেলে ছুটছেন আর লিলিদি তাকে ধরবার অক্ষম চেষ্টা করছেন, বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। এইবার বেশ শান্ত গলায় বললাম, 'আপনি এত নিষ্ঠুর কেন? ভালোবাসার মতো মেয়ের কি আপনার অভাব ?' খোঁচা খেয়ে বাঘের মতো গর্জন করে বললেন, 'আমার একটা নিরাপদ আশ্রয়, পাকাপাকি বাসস্থান, নিরুপদ্রব জীবন চাই, আমি গোটা সময় নাটকের জন্য দিতে চাই। এই অনিশ্চিত জীবনে নাটকের জন্য সবটা দেওয়া যায় না। লিলির শ্যামবাজারে একটা বাসস্থান আছে, একটা চাকরি আছে, আমাকে নিশ্চিন্ত অবসর দিতে পারবে। তাই ওকেই বিয়ে করব।' আমি বললাম, 'লিলিদিকে আপনি ভালোবাসেন ?' উত্তরে গম্ভীরভাবে বললেন, 'লিলি আমাকে পছন্দ করে। ওরও তো কেউ নেই।'

তারপর আরও কিছু কথা হয়তো হয়েছিল। সে সব আমার মনে নেই। সেই মুহূর্তে অজিতদাকে কেন যেন আমার খুব অচেনা, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, খাটো মাপের মনে হয়েছিল। সেই বিয়ে হল, অজিতদা অজিতেশদা হলেন, গণনাট্য ও পার্টি ইত্যাদি ধীরে ধীরে ছাড়লেন। নতুন ধরনের নাটকের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকবছর পর বান্ধবীসহ আমার সঙ্গে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে সস্ত্রীক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দেখা। একটা ট্যাক্সির খোঁজ করছেন। বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি তখন প্রাণপণে বৌদির মধ্যে লিলিদিকে খুঁজছি। সাদা কাপড় পরা, এক পোঁচ পাউডারও যিনি গালে দিতেন না সেই লিলিদি কোথায় ! আমার সামনে দাঁড়িয়ে দামি সিল্ক ও কসমেটিকসে মোড়া এক মহিলা। মনে হল প্রতিযোগীতা সম্পর্কে তিনি বেশ সচেতন। তারপরের ঘটনাবলিতে কোনো বৈচিত্র্য নেই, অন্তত আমার কাছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত খ্যাতির শীর্ষ স্পর্শ করেছেন। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের সঙ্গে এক সারিতে নাম উচ্চারিত হয়। অনেক স্মৃতি রোমন্থনযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা উপহার দিয়েছেন। শ্যামবাজারে রাস্তায় দেখা হলে সেন মহাশয়ের দোকানে দূর থেকে ডেকে সন্দেশ খাওয়াতেন, না বললে রেগে যেতেন ভাবতেন উপেক্ষা করছি বা হয়তো পুরানো কথা মনে পড়ত, নাটক দেখার জন্য আমন্ত্রন জানাতেন, সমালোচনা করলে ভীষণ উত্তেজিত ভাবে কোনটা কেন কী ভেবে করেছেন বোঝাতে চেষ্টা করতেন। বিতর্ক হত, আর সেই বিতর্কের মধ্যেই মাঝে মাঝে অজিতেশ নয় সেই পুরানো অজিতদাকে খুঁজে পেতাম।

Society Language and Culture